ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও পুনর্বাসনে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়ন

মোঃ ইমাম হোসেন[১]

সারসংক্ষেপ

ভিক্ষাবৃত্তি একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট যা কেবল ব্যক্তির সম্মানহানি ঘটায় না বরং জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টাকেও ব্যাহত করে। বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা এবং মানবিক মর্যাদা রক্ষার অংশ হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জেলার ভিক্ষুকদের বিকল্প কর্মসংস্থান, দক্ষতা উন্নয়ন, আর্থিক সহায়তা এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত এই কর্মসূচির কার্যকারিতা ও প্রভাব মূল্যায়ন করা। বিশেষ করে উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, উপকরণ ও অনুদানের বাস্তব প্রভাব, জনসচেতনতা, মোবাইল কোর্টের ভূমিকা এবং টেকসই পুনর্বাসনের সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল নীতি-নির্ধারকদের জন্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কর্মসূচির উন্নয়নে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমাজসেবা অধিদপ্তরের ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, বিকল্প আয়ের সুযোগ, পুনর্বাসনের টেকসইতা, এবং সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা। গবেষণায় ২৬০ জন সুফলভোগীদের নিকট হতে পরিমাণগত এবং ৫টি দলীয় আলোচনা (FGD) ও ২৫ জন মূখ্য উত্তরদাতাগণের (KII) নিকট হতে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এছাড়াও ৫টি কেস স্টাডি, সরেজমিন পর্যবেক্ষণ এবং কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্টদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণায় তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ের সীমিত বাস্তবায়ন ও প্রস্তুতির ধাপ পেরিয়ে কর্মসূচিটি ধীরে ধীরে একটি প্রাতিষ্ঠানিক, সম্প্রসারিত এবং ফলপ্রসূ পুনর্বাসন কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন শাখা, জেলা প্রশাসন এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের সম্মিলিত চেষ্টায় এটি বর্তমানে সমাজ থেকে ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনে একটি কার্যকর মডেল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ২৬০ জন সুফলভোগীর সবাই পূর্বে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত ছিলেন। পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় আসার পর তারা বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হয়েছেন। বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এই পরিবর্তন কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। অনেকেই আগে দৈনিক ১ বা ২ বেলা আহার করলেও বর্তমানে অধিকাংশ উপকারভোগী ৩ বেলা পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করছেন। অধিকাংশ উপকারভোগী বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ যেমন: ছাগল/ভেড়া, মুদি দোকান, বকনা বাছুর, রিকশা-ভ্যান, সেলাই মেশিন ইত্যাদি পেয়েছেন এবং তা দিয়ে উপার্জন শুরু করেছেন। এককালীন অনুদান পেয়ে উপকারভোগীরা দোকান, হাঁস-মুরগির খামার, গরু পালন, ভ্যান-রিকশা চালনা, সেলাই কাজ প্রভৃতি পেশায় নিয়োজিত হয়েছেন। অনেকে নতুন করে কাজ শিখে তার ওপর ভিত্তি করে আয়ের পথ গড়ে তুলেছেন, যা তাদের সংসারের স্থায়ী উৎসে পরিণত হয়েছে। অনুদানের মাধ্যমে উপার্জনের সুযোগ পেয়ে প্রায় সকল উপকারভোগীর মাসিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ প্রদানের ফলে উপকারভোগীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে এবং তাদের জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। এটি শুধু আর্থিক স্বনির্ভরতার পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদার উন্নয়নে সহায়ক। জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের ফলে ভিক্ষাবৃত্তির সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা কমেছে এবং পুনর্বাসনের প্রতি জনগণের সহানুভূতি ও ইতিবাচক মনোভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ধারা অব্যাহত রাখা গেলে ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনের পথ আরও মজবুত ও টেকসই হয়েছে। উপকারভোগীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পেশাভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ (যেমন– পশুপালন, হস্তশিল্প, ক্ষুদ্রব্যবসা) নিয়মিত ও পর্যাপ্ত সময় ধরে পরিচালনা করা প্রয়োজন। এককালীন অনুদান কিংবা উপকরণ প্রদান করার পর নিয়মিত মনিটরিং নিশ্চিত করতে হবে, যেন উপকারভোগীরা সঠিকভাবে তা ব্যবহার করছেন এবং পুনরায় ভিক্ষাবৃত্তিতে ফিরে না যান। উপকারভোগীর দক্ষতা, পছন্দ এবং বাজার পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে আয়বর্ধক উপকরণ/অনুদান নির্বাচন করা উচিত।

অভিযানের মাধ্যমে নতুন ভিক্ষুক শনাক্ত ও পুনর্বাসনের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ রোধ করা দরকার। উপকারভোগীদের তথ্য সংরক্ষণ, অগ্রগতি ট্র্যাকিং এবং ভবিষ্যত সহায়তার জন্য একটি কেন্দ্রীয় তথ্যব্যবস্থা (MIS) গড়ে তোলা উচিত। সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও পুনর্বাসন কর্মসূচি দেশের প্রান্তিক, অসহায় ও জীবনধারণে অক্ষম জনগোষ্ঠীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক হস্তক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই গবেষণায় সংগৃহীত তথ্য ও পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা গেছে, উপকারভোগীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এককালীন আর্থিক সহায়তা, বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ এবং কাউন্সেলিং প্রাপ্তির মাধ্যমে ধীরে ধীরে স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আয় বৃদ্ধি, খাদ্যনিরাপত্তা, বাসস্থান উন্নয়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মতো ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। তবে, কিছু চ্যালেঞ্জও স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়েছে—যেমন, যথাযথ মনিটরিংয়ের অভাব, প্রশিক্ষণ সীমিততা, অনুদান ব্যবহার পর্যবেক্ষণে দুর্বলতা এবং কিছু ক্ষেত্রে পুনরায় ভিক্ষাবৃত্তিতে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা। এই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, কর্মসূচিটি একটি সম্ভাবনাময় ও সময়োপযোগী উদ্যোগ হলেও এর টেকসই সফলতা নির্ভর করছে কার্যকর তত্ত্বাবধান, অংশীজনদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং প্রেক্ষিতভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ওপর। ভবিষ্যতে, উপকারভোগীদের চাহিদানির্ভর প্রশিক্ষণ, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সঙ্গে সংযুক্তকরণ, এবং সচেতনতা কার্যক্রম জোরদার করার মাধ্যমে এই উদ্যোগকে আরও সমৃদ্ধ ও ফলপ্রসূ করা সম্ভব হবে।

[১] মোঃ ইমাম হোসেন, মূখ্য গবেষক (টিম লিডার), মাস্টার্স (ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট), অনার্স (নৃবিজ্ঞান বিভাগ), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ভূমিকা/গবেষণা সমস্যা

প্রাচীন কাল থেকেই মানব সমাজে ভিক্ষাবৃত্তি চলে আসছে। উপমহাদেশেও এর ইতিহাস দীর্ঘ দিনের। বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলের শোষন, বঞ্চনা এবং নদী ভাঙ্গন, দারিদ্র্য, রোগ-ব্যাধি, অশিক্ষা ইত্যাদি কারণে ভিক্ষাবৃত্তির ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। বর্তমান সময়ে কিছু মানুষের কর্ম বিমুখতা এবং একদল স্বার্থান্বেষী মহলের অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। ভিক্ষাবৃত্তি একটি সামাজিক ব্যাধি। এটি স্বীকৃত কোন পেশা নয়। বর্তমানে বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে। স্বল্পোন্নত দেশের অবস্থান থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উত্তরণ ঘটেছে। ভিক্ষাবৃত্তির লজ্জা থেকে দেশকে মুক্ত করার সময় এসেছে। দেশে দারিদ্র্য নিরসনে সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং ভিক্ষাবৃত্তির মত অমর্যাদাকর পেশা থেকে মানুষকে নিবৃত করার লক্ষ্যে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য সরকারের রাজস্ব খাতের অর্থায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 'ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান শীর্ষক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। আগস্ট/২০১০ খ্রিঃ হতে কর্মসূচি'র কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১০ সাল হতে ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হলেও তা তেমন ব্যাপকতা পায়নি। বিষয়টি বিবেচনায় এনেই ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রথম বারের মত দেশের ৫৮টি জেলায় ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের নিমিত্তে অর্থ প্রেরণ করা হয়।

গবেষণার যৌক্তিকতা

ভিক্ষাবৃত্তি একটি সমাজ-অর্থনৈতিক ও মানবিক সংকট, যা শুধু ব্যক্তিকে নয়, বরং সামগ্রিকভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। বাংলাদেশ সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও পুনর্বাসনের জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছে তা মূলত প্রান্তিক, অসহায়, কর্মহীন ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের একটি সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা। তবে এই কর্মসূচির বাস্তব প্রভাব, কার্যকারিতা, চ্যালেঞ্জ এবং টেকসইতা নিরূপণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আরও কার্যকর, জনবান্ধব ও বাস্তবমুখী হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য

১) সমাজ থেকে ভিক্ষাবৃত্তি দূর করা ও ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে দক্ষতা ও পেশা ভিত্তিক এককালীন আর্থিক অনুদানের প্রভাব;

২) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দক্ষতা ভিত্তিক ও উপার্জনমুখী যেসব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রভাব;

৩) এ বিষয়ে সরকারী/ বেসরকারী/ স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহায়তায় সমন্বিত পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণের প্রভাব;

৪) প্রচার মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তির কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার অগ্রগতি মূল্যায়ন;

৫) শারীরিকভাবে অক্ষম/অসুস্থ ভিক্ষুকদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থার গ্রহণের প্রভাব মূল্যায়ন।

৬) ভাসমান আশ্রয়হীন ব্যক্তিদের স্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা করা ও ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠিকে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠিতে পরিণত করার ব্যবস্থা গ্রহণের প্রভাব মূল্যায়ন।

তাত্ত্বিক কাঠামো ও পূর্বপাঠ পর্যালোচনা

ভিক্ষাবৃত্তির ধারণা

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান নীতিমালা-২০১৮ অনুসারে সড়ক, ফুটপাত, ট্রাফিক সিগন্যাল, বিভিন্ন মার্কেট, পার্ক, রেল স্টেশন, বিভিন্ন অফিস, মসজিদ, মাজার অথবা অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানে যে ব্যক্তি নিজের অসহায়ত্ব অন্যের নিকট উপস্থাপন করে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করে সে-ই ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তি বলে গণ্য হবে। (ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান নীতিমালা, ২০১৮)। অন্যের করুনা ও সহানুভূতি আকৃষ্ট করার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা। ভিক্ষাবৃত্তি পরনির্ভর জীবন ধারণের উপায়। কোন ভিক্ষুক স্বীয় অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব অপরের নিকট বিশেষ করুনা লাভের উদ্দ্যেশে প্রকাশ্যে অপরের নিকট উপস্থাপন করে। ভিক্ষাবৃত্তি হলো কোনরূপ প্রতিদানহীন সাহায্যলাভের কৌশল। আন্তর্জাতিক সংস্থা UN-HABITAT ও ILO-এর রিপোর্টসমূহ অনুযায়ী ভিক্ষাবৃত্তি একটি নগরভিত্তিক দারিদ্র্য ও সামাজিক নিরাপত্তার ঘাটতির প্রতিচ্ছবি। UN-HABITAT নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী, আশ্রয়হীনতা ও মানবিক মর্যাদা হারানোর প্রসঙ্গে বলেছে "Begging is often seen as a visible symptom of urban poverty, homelessness, and social exclusion, reflecting the failure of social protection systems to adequately address the needs of the most marginalized populations." অর্থাৎ ভিক্ষাবৃত্তি হলো নগর দরিদ্রতা, আশ্রয়হীনতা এবং সামাজিক বঞ্চনার দৃশ্যমান প্রতিফলন, যা মূলত সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণে বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতাকে তুলে ধরে। (UN-HABITAT, Urban Poverty Report, 2016)। ILO ভিক্ষাবৃত্তিকে "অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের চরম অনানুষ্ঠানিক ও অবমাননাকর রূপ" হিসেবে উল্লেখ করেছে: "Begging constitutes one of the most severe forms of informal, unregulated, and exploitative economic activity, often resulting from extreme poverty, exclusion from the labour market, and lack of access to decent work opportunities." অর্থাৎ ভিক্ষাবৃত্তি হলো অপ্রাতিষ্ঠানিক, অনিয়ন্ত্রিত ও শোষণমূলক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম চরম রূপ, যা সাধারণত চরম দারিদ্র্য, শ্রমবাজার থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং মর্যাদাপূর্ণ কাজের সুযোগের অভাবের কারণে ঘটে। (ILO, Decent Work and Informal Economy Report, 2019)

ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন কার্যক্রম ও ক্রমবিকাশ

ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য সরকারের রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ২০১০ সালে 'ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান' শীর্ষক কর্মসূচি চালু করা হয়। তবে শুরুতে এই কার্যক্রম ছিল একেবারেই সীমিত পরিসরে। ২০১০-১১

অর্থবছরে এই কর্মসূচির জন্য ৩ কোটি ১৬ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। তবে ব্যয় করা হয় মাত্র ১৮ লাখ টাকা। পরের ৬ বছরও এই কর্মসূচির চিত্র অনেকটা একই রকম ছিল। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য প্রথমবারের মতো দেশের ৫৮টি জেলায় অর্থ দেওয়া হয়। তখন থেকে প্রতিবছরই এ খাতে বরাদ্দ ও ব্যয় বেড়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে পাওয়া হিসাব অনুযায়ী, গত ১৩ অর্থবছরে (২০১০-১১ থেকে ২০২২-২৩) ভিক্ষুক পুনর্বাসন বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৭৫ কোটি ২৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এর মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪২ কোটি ৬৪ লাখ ৩৮ হাজার টাকা। ঢাকার মিরপুর, নারায়ণগঞ্জের বেতিলা, গাজীপুরের কাশিমপুর ও পুবাইল জমিদারবাড়ি, ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার ধলা এবং মানিকগঞ্জের পুরোনো জমিদারবাড়িতে সরকারি ভবঘুরে আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে। এই আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন করা হয়। সরকারিভাবে ১ হাজার ৭০০ ভবঘুরেকে এই আশ্রয়কেন্দ্রে রাখার কথা। তবে পুরোনো জমিদারবাড়িগুলো সংস্কারের অভাবে ধারণক্ষমতা কমে যাওয়ায় বর্তমানে এসব আশ্রয়কেন্দ্রে প্রায় এক হাজার ভবঘুরেকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। গত (২০২১-২২) অর্থবছরে ভিক্ষুক পুনর্বাসন প্রকল্পে বরাদ্দ ছিল ২৬ কোটি ৮০ লাখ টাকা। ওই বছর ৬৩টি জেলায় অর্থ পাঠানোর পাশাপাশি মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আটক ভিক্ষুকদের আশ্রয়ের জন্য ১৬টি ডরমিটরি নির্মাণে অর্থ বরাদ্দ ছিল। সে অনুযায়ী দেশের ৫টি সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রের ভেতরে ফাঁকা জায়গায় অস্থায়ী ভিত্তিতে টিনশেড ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর মধ্যে ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার ধলায় ৬টি, গাজীপুরে কাশিমপুর ও পুবাইলে ৪টি করে ৮টি, নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল এবং ঢাকার মিরপুরে সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে একটি করে ডরমিটরি নির্মাণ করা হচ্ছে। এসব ভবনের নির্মাণকাজ শেষ হলেও রাস্তা এবং কিছু কাজ এখনো বাকি আছে। তার আগেই বরাদ্দ অর্থের মধ্যে ২৬ কোটি ৭৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৩০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ২ হাজার ৬০০ জন ভিক্ষুকে আটক করা হয়েছে। এর মধ্যে ১ হাজার ৮০৫ জনকে ভিক্ষাবৃত্তি না করার শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়। বাকি ৭৯৫ জনকে বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠানো হয়।

ভিক্ষাবৃত্তিরোধের প্রচেষ্টা: অতীত ও বর্তমান

ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১ অনুযায়ী, পুলিশের সাবইন্সপেক্টর পদমর্যাদার থেকে নিচে নয় এমন কর্মকর্তা, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কোনো ব্যক্তিকে ভবঘুরে বলে গন্য করার যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে মর্মে নিশ্চিত হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে যে কোনো স্থান হইতে যেকোনো সময় আটক করিতে পারবেন। এই আইন অনুযায়ী যদি উক্ত ব্যক্তি ভবঘুরে না হয় তাহলে কারণ লিপিবদ্ধ করে উক্ত ব্যাক্তিকে বিনা শর্তে বা ক্ষেত্রমতো প্রয়োজনীয় মুচলেকা গ্রহণপূর্বক তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তিদানের আদেশ প্রদান করবেন। আর যদি ভবঘুরে হয় তাহলে তিনি কারন লিপিবদ্ধ করে উক্ত ব্যক্তিকে ভবঘুরে ঘোষণাপূর্বক এ আইনের অন্যান্যবিধান সাপেক্ষে যেকোনো আশ্রয় কেন্দ্রে অনধিক দুই বছেরের জন্য আটক রাখিবার নিমিত্ত অভ্যর্থনা কেন্দ্রে আদেশ প্রধান করবে। এ আইন অনুযায়ী প্রতিটি সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য একটি ভবঘুরে কল্যাণ তহবিল গঠন করবে। গঠিত তহবিলে সরকার, বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান এবং আশ্রয় কেন্দ্রের কোন আয় ও আশ্রিত ভবঘুরে ও নিরাশায় ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত কোন লাভজনক কাজের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ যদি থাকে জমা হইবে।

গবেষণা পদ্ধতি

যে কোন সমীক্ষায় গবেষণা পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের কৌশলের উপর গবেষণার প্রকৃত ফলাফল নির্ভর করে। আলোচ্য গবেষণা কাজে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি দুই ধরনের উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গবেষণা সমীক্ষার উদ্দেশ্য সম্পন্ন করার জন্য পরিমানগত (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) দুই ধরনের পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়েছে। পরিমানগত (Quantitative) জরিপ – ২৬০ জন উপকারভোগীর নিকট থেকে KoBoToolbox ব্যবহার করে ডেটা সংগ্রহ করা হয়েছে। তিনটি বিভাগের ৪টি জেলা হতে এ সকল নমুনা তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যা পরবর্তীতে প্রারম্ভিক পর্যায়ে কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার প্রেক্ষাপটে ঠিক করা হয়েছে। এই গবেষণায় ২০টি ডকুমেন্ট পর্যালোচনা, মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (KIIs)-২৫টি, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD)-৫টি, সরজমিনে পর্যবেক্ষণ- ১টি, সফলগাথা (Success Story) উপস্থাপন- ৫টি, কার্যক্রমের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ এবং সেমিনারের মাধ্যমে উক্ত তথ্য-উপাত্ত ভ্যালিডেশন (Validation) করা হয়েছে।

তথ্য-উপাত্তের উৎস ও সংগ্রহ পদ্ধতি

প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য প্রশ্নমালা জরিপ, দলীয় আলোচনা, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার, সরাসরি মাঠ পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহের কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। সেকেন্ডারি উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের বিভিন্ন প্রতিবেদন যেমন অগ্রগতি প্রতিবেদন, মধ্যবর্তী গবেষণা প্রতিবেদন, সমাপ্তি প্রতিবেদন, বিভিন্ন পুস্তক, ম্যাগাজিন, জার্নাল, পত্রিকা, গবেষণা প্রতিবেদন ইত্যাদির সাহায্য নেয়া হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহকারীর প্রশিক্ষণ

অত্র সমীক্ষায় তথ্য সংগ্রহ কাজে মোট ২ জন তথ্য সংগ্রহকারীকে নিয়োজিত করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত করার পূর্বে তথ্য সংগ্রহকারীদের তথ্য সংগ্রহ কৌশল এবং মাঠ পর্যায় কাজের ধরণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে সংগৃহীত তথ্যের সংখ্যাগত ও গুণগতমান বজায় থাকে। পরামর্শকবৃন্দ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রশিক্ষণে গবেষণা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালা-উত্তর সংগ্রহ ও রেকর্ডের কৌশল সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রশ্নমালার প্রতিটি প্রশ্ন সম্পর্কে বিশদভাবে ব্যখ্যা প্রদানকরতঃ সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে যাতে তারা সাবলীল ভাবে মাঠপর্যায়ে কাজ সম্পাদন করতে পারে। মাঠপর্যায়ে প্রশ্নমালা টেষ্টিং এর জন্য প্রকৃত সুফলভোগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং প্রশ্নমালার কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি, সংযোজন বা বিয়োজনের প্রয়োজন দেখা দিলে তা

সংশোধন করা হয়েছে। এভাবে সংশোধিত প্রশ্নমালা মাঠ পর্যায় হতে সুফলভোগী এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহের জন্য চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ

মাঠ পর্যায়ে সঠিকভাবে তথ্য সংগ্রহের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রেখে তথ্য সংগ্রহকারীদের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়েছে। নমুনায়িত সব এলাকার তথ্য সংগ্রহের কাজ পরিদর্শন করা যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। তাই পরামর্শকদের পক্ষে সীমিত সময়ে যত বেশী সংখ্যক এলাকায় তথ্য সংগ্রহের কাজ পরিদর্শন করা সম্ভব তা করা হয়েছে। পরামর্শক ছাড়াও জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির অধ্যক্ষ মহোদয় তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন।

এডিটিং ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণ

প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত সমূহকে প্রাথমিক তথ্যের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। সমীক্ষার কার্যক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে Tabulation Plan প্রস্তুত করা হয়েছে। নিম্নোক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ক) প্রশ্নাবলী সম্পাদনা ও কোডিং: কম্পিউটারে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে প্রতিটি প্রশ্নপত্রকে সম্পাদনা ও কোডিং করা হয়েছে।

খ) তথ্য প্রক্রিয়াকণ ও বিশ্লেষণঃ সংগৃহীত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণের জন্য কম্পিউটারে ডাটাবেইজ তৈরী করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল

ভিক্ষাবৃত্তি একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা, যা সমাজের নীচুতলার মানুষের দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অশিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাবকে প্রতিফলিত করে। এটি শুধুমাত্র ব্যক্তি ও পরিবারকেই নয়, পুরো সমাজ ও রাষ্ট্রকেই নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সময়ে ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনের লক্ষ্যে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও স্বনির্ভরতা অর্জনের কর্মসূচি অন্যতম। এই কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদেরকে এককালীন আর্থিক সহায়তা, বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ, কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া হয়, যাতে তারা স্বনির্ভর ও সম্মানজনক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হন। পাশাপাশি মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে এলাকাভিত্তিক ভিক্ষাবৃত্তি হ্রাসে সচেতনতা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নেওয়া হয়। এই গবেষণায় লক্ষ্য ছিল ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের বাস্তবধর্মী প্রভাব ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা। এই গবেষণায় ২৬০ জন নমুনায়িত উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, জীবিকা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, সঞ্চয় ও সম্পদে পরিবর্তনের মাত্রা পরিমাপের পাশাপাশি কর্মসূচির প্রভাব চিহ্নিত করা হয়েছে। শহর সমাজসেবা কর্মকর্তাসহ মূখ্য তথ্যদাতাদের মতামতও এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ, নীতিনির্ধারক এবং গবেষকরা ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনে কার্যকর ও টেকসই কৌশল গ্রহণে সহায়ক তথ্য ও বিশ্লেষণ লাভ করবেন।

ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও পুনর্বাসন কর্মসূচিতে বছরভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ, ব্যয় এবং উপকারভোগীর সংখ্যা বিশ্লেষণ

সমাজসেবা অধিদপ্তরের ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের আর্থিক এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতিকে বিভিন্ন অর্থবছরে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, শুরুতে কার্যক্রমটি মূলত প্রস্তুতিমূলক ছিল এবং সময়ের সাথে সাথে এটি একটি পরিকল্পিত ও বিস্তৃত কর্মসূচিতে রূপ লাভ করেছে। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে এই কর্মসূচির যাত্রা শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে বরাদ্দকৃত অর্থ মূলত জরিপ ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রমে ব্যয় হয়, যেমন ময়মনসিংহ ও জামালপুর জেলায় জরিপ পরিচালনা। ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরেও প্রায় একই ধারা অব্যাহত থাকে। এ সময়ে যদিও উল্লেখযোগ্য অংকের অর্থ বরাদ্দ করা হয়, যেমন ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১০ কোটি টাকা, কিন্তু সেই অর্থের বাস্তব ব্যবহার খুবই সীমিত ছিল। এর থেকে বোঝা যায় যে, কার্যক্রমটি তখনও বাস্তবায়নের পূর্ণ প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এরপর ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কার্যক্রমে গতি আসে। এই সময়ের মধ্যে উপকারভোগীদের পুনর্বাসনের বাস্তব প্রয়োগ শুরু হয়। যথাক্রমে ২৫১ ও ৪১০ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসনের আওতায় আনা হয়। অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালকদের মাধ্যমে স্থানীয় বাস্তবতায় ভিত্তি করে অর্থ ব্যয় করা হয়। এ সময়ের মধ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ প্রায় পুরোপুরি ব্যয় করা হয়, যা থেকে বোঝা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠতে শুরু করেছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে কার্যক্রমটি একটি পূর্ণাঙ্গ পুনর্বাসন কার্যক্রমে রূপ নেয়। এ বছর ৩০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ও সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করা হয় এবং এক বছরে প্রায় ২৭১০ জন উপকারভোগী পুনর্বাসিত হন। পরবর্তী দুই অর্থবছরেও একই সংখ্যক উপকারভোগীকে অন্তর্ভুক্ত করে কার্যক্রমের বিস্তৃতি অব্যাহত থাকে। এই সময় দেশের ৩৮ থেকে ৫৮টি জেলার মধ্যে বরাদ্দ বিতরণ করা হয়, যা কর্মসূচির ভৌগোলিক পরিসর বৃদ্ধির একটি পরিষ্কার ইঙ্গিত।২০২০-২১ অর্থবছর থেকে বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিমাণে আরও বড় ধরনের বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। এই বছর ৫০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ও সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করা হয় এবং উপকারভোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৮৫০ জনে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি দেখা যায় ২০২১-২২ অর্থবছরে, যেখানে বরাদ্দ হয় ২৬৮০ লক্ষ টাকা এবং প্রায় সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করা হয়। একইসাথে, ৩০০০ জন উপকারভোগী পুনর্বাসনের পাশাপাশি ১৬টি সেমিপাকা আবাসিক ভবন নির্মাণ, প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় এবং প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়। এটি কর্মসূচির একটি বাস্তবভিত্তিক, অবকাঠামোগত উন্নয়নের নিদর্শন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১২০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয় এবং প্রায় সম্পূর্ণ অর্থ ৬৩টি জেলায় ব্যয় করা হয়। এ বছরেও উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ৩০০৩ জন। পরবর্তী ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বরাদ্দের একই ধারা বজায় থাকে, এবং সম্ভাব্য উপকারভোগীর সংখ্যা ধরা হয় ৩০০০ জন করে। যদিও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দ ছাড়ের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে, তবুও এটি কর্মসূচির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার একটি নিদর্শন। এই পর্যালোচনা থেকে স্পষ্ট যে, প্রাথমিক পর্যায়ের সীমিত বাস্তবায়ন ও প্রস্তুতির ধাপ পেরিয়ে কর্মসূচিটি ধীরে ধীরে একটি প্রাতিষ্ঠানিক, সম্প্রসারিত এবং ফলপ্রসূ পুনর্বাসন কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন শাখা, জেলা প্রশাসন এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের সম্মিলিত চেষ্টায় এটি বর্তমানে সমাজ থেকে ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনে একটি কার্যকর মডেল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক বিষয়াবলী

জরিপে অংশগ্রহণকারী নারী ও পুরুষের হার পুরুষ ৫৭% ও মহিলা ৪৩%। সুফলভোগীদের মধ্যে বিবাহিত ৪৮.৪৬%, অবিবাহিত ৮.৮৫%, তালাকপ্রাপ্ত ৩.৪৬%, বিপত্নীক ৩.৮৫% ও বিধবা ৩৫.৩৮%। সর্বোচ্চ অংশ নিরক্ষর (৫৩.৮৫%)। যারা কেবল স্বাক্ষর করতে পারে (৩১.৯২%) কিংবা লিখতে পড়তে পারে (৭.৩১%) তাদের মধ্যে কিছুটা সক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু পর্যাপ্ত দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ না থাকায় কর্মসংস্থানে যুক্ত হতে পারছে না। নমুনা বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ২০২২ সালেই সবচেয়ে বেশি সুফলভোগী কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছেন। এ বছরই নমুনার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। এর ফলে অনুমান করা যায়, ২০২২ সালে পুনর্বাসন কার্যক্রমে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কার্যক্রমটি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করেছিল। ২০২৩ ও ২০২৪ সালেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তি কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন যা ইঙ্গিত করে যে, কর্মসূচিটি ধারাবাহিকভাবে কার্যকরভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। তবে ২০২০ ও ২০২১ সালে যুক্ত হওয়া সুফলভোগীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, যা স্বাভাবিকভাবে একটি নতুন কর্মসূচির প্রাথমিক পর্যায়ের সীমিত প্রসারকে নির্দেশ করে। ২০২৫ সাল এখনো চলমান বছরের অংশ হওয়ায় এই সময়ে অন্তর্ভুক্ত সুফলভোগীর সংখ্যা কম দেখা যেতে পারে। তবে এটি ইঙ্গিত করে যে, কার্যক্রমটি বর্তমানে চলমান রয়েছে এবং নতুন সুফলভোগীদের অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়া এখনও চলছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ২৬০ জন সুফলভোগীর সবাই পূর্বে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত ছিলেন। পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় আসার পর তারা বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হয়েছেন। প্রায় অর্ধেক সুফলভোগী (প্রায় ৪৭ শতাংশ) ক্ষুদ্র ব্যবসায় যুক্ত হয়েছেন। রিকশা বা ভ্যান চালক হিসেবে কাজ করছেন প্রায় ১৫ শতাংশ ব্যক্তি।

সুফলভোগীদের পরিবারের মাসিক গড় আয়ে একটি উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে। কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে, অধিকাংশ পরিবারের আয় ছিল অত্যন্ত কম। মোট নমুনার ৪৩ শতাংশ পরিবারের আয় ছিল ৫,০০০ টাকার নিচে, এবং ৫৫ শতাংশের আয় ছিল ৫,০০১ থেকে ১০,০০০ টাকার মধ্যে। মাত্র ১.৫৪ শতাংশ পরিবার ছিল যারা ১০,০০০ টাকার ওপরে আয় করতেন। অপরদিকে, কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর, শুধু ১৬.৫৪ শতাংশ পরিবার ৫,০০০ টাকার নিচে আয় করছে, যা পূর্বের তুলনায় প্রায় অর্ধেক হয়েছে। একই সঙ্গে ১০,০০০ টাকার বেশি আয়ের পরিবারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩.০৮ শতাংশে, যা কার্যক্রমের একটি বড় সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এটি ইঙ্গিত করে যে, ভিক্ষাবৃত্তি থেকে উৎপাদনশীল পেশায় স্থানান্তর, দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং এককালীন অনুদান এই তিনটি প্রধান উপাদান সুফলভোগীদের আয়ের মানোন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, উচ্চ আয়ের গ্রুপে পরিবর্তন সূচকীয়ভাবে বেড়েছে, যা শুধু ব্যক্তিপর্যায়ে নয় বরং পরিবারের সামগ্রিক আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এটি ইঙ্গিত করে যে অনেক পরিবার এখন খাবার, শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে আগের তুলনায় বেশি ব্যয় করতে পারছে। ৫,০০০ টাকার কম ব্যয় করা পরিবার ৫৪.২৩% থেকে নেমে এসেছে ৩৪.৬২%-এ। এটি প্রমাণ করে যে পরিবারগুলো দারিদ্র্য সীমা থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে। মধ্যম স্তরের ব্যয় (৫,০০১–১০,০০০ টাকা) প্রায় একই রয়ে গেছে (৪৫%), যা বোঝায় অনেক পরিবার এখন মাঝারি অর্থনৈতিক সক্ষমতার মধ্যে অবস্থান করছে। সামগ্রিকভাবে দেখা যায়, সমাজসেবা অধিদপ্তরের পুনর্বাসন কর্মসূচির ফলে পরিবারগুলোর ব্যয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা থেকে বোঝা যায় জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা খাতে খরচের প্রবণতা বেড়েছে এবং দারিদ্র্য বিমোচনের একটি বাস্তব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এই তথ্য বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, কর্মসূচি সুফলভোগীদের আর্থিকভাবে স্থিতিশীল করে তুলছে। তারা শুধু ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং তাদের পারিবারিক খরচ বৃদ্ধি-এর মধ্য দিয়ে একটি উন্নত জীবনধারার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও পুনর্বাসন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের পূর্বে উপকারভোগীদের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা ছিল প্রায় সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। উক্ত সময়ে ৯৮% (২৫৫ জন) ভিক্ষুকের মাসিক কোনো সঞ্চয় ছিল না। মাত্র ৫ জন উপকারভোগী (২%) অল্প পরিমাণে, অর্থাৎ ১,০০০/- টাকারও কম সঞ্চয় করতে সক্ষম ছিলেন। অপরদিকে, পুনর্বাসন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর সঞ্চয়ের চিত্রে একটি সুস্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সঞ্চয়হীন উপকারভোগীর সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১২১ জন, যা মোটের ৪৭%। অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক উপকারভোগী এখন সঞ্চয় করতে পারছেন। ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও পুনর্বাসন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আগে উপকারভোগীদের বেশিরভাগেরই নিজস্ব কোনো সম্পত্তি ছিল না বা তা ছিল অত্যন্ত সীমিত। তবে, কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির পরে উপকারভোগীদের আর্থিক স্বচ্ছলতা কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় সম্পত্তি অর্জনের ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। নিজস্ব বাড়ি বা বাসার মালিকানা ছিল কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে ৭০% (১৮২ জন) উপকারভোগীর। এই সংখ্যা কার্যক্রম পরবর্তী সময়ে প্রায় অপরিবর্তিত থেকে ৬৯% (১৮০ জন)-এ দাঁড়িয়েছে, যা থেকে বোঝা যায় বাড়ি বা বাসার মালিকানার ক্ষেত্রে বড় কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। মোবাইল ফোন মালিকানায় স্পষ্ট অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। পূর্বে ৬৭% (১৭৫ জন) মোবাইল ফোনের মালিক থাকলেও কার্যক্রম পরবর্তীতে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৭৯% (২০৫ জন)। এটি যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে প্রবেশাধিকারের একটি সুস্পষ্ট অগ্রগতি নির্দেশ করে। হাঁস-মুরগী পালন ছিল পূর্বে ৩৬% উপকারভোগীর কাছে, যা পরবর্তীতে ৫১%-এ উন্নীত হয়। এটি পরিবারভিত্তিক ক্ষুদ্র পোষা প্রাণি পালন বা খামার ব্যবস্থার বিস্তারকে তুলে ধরে।

নিজস্ব দোকান থাকার হার ৬% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮%-এ দাঁড়িয়েছে। এটি ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে বিকল্প কর্মসংস্থানে যুক্ত হওয়ার একটি শক্তিশালী নির্দেশক। উপকারভোগীর উপর ভিত্তি করে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, পুনর্বাসন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে ও পরে তাদের খাবার গ্রহণের সংখ্যায় লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা গেছে। পুনর্বাসন পূর্বে, উপকারভোগীদের মধ্যে ৯৪ জন (৩৬%) প্রতিদিন মাত্র ২ বেলা খাবার খেতেন। এর বিপরীতে ১৬৬ জন (৬৪%) নিয়মিত ৩ বেলা খাবার গ্রহণ করতেন। যদিও ১ বেলা খাবার গ্রহণকারী কারো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি, তবে ৩ বেলার পরিবর্তে ২ বেলা খাওয়ার সংখ্যাটি একটি পুষ্টিগত ঝুঁকির দিক নির্দেশ করে। অন্যদিকে, পুনর্বাসন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরে একই ব্যক্তিদের মধ্যে ২৪৯ জন

(৯৬%) নিয়মিত ৩ বেলা খাবার গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন। মাত্র ১১ জন (৪%) এখনো দিনে ২ বেলা খেয়ে থাকেন। এই তথ্য স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বেরিয়ে পুনর্বাসনের পর তাদের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়েছে খাদ্যাভ্যাসে। পুনর্বাসনের পর উপকারভোগীদের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিমান নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে।

এটি তাদের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত। তিন বেলা খাবার গ্রহণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বোঝা যায়, তাঁরা এখন নিয়মিত আয়ের মাধ্যমে পরিবারের খাদ্য চাহিদা পূরণে সক্ষম হচ্ছেন। কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বে মাত্র ৩৮% অংশগ্রহণকারী দৈনিক খাবারে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ও শাক-সবজি সহ পুষ্টিকর উপাদান গ্রহণ করতেন, যেখানে ৬২% অংশগ্রহণকারী এই ধরনের পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে অনীহা বা অক্ষম ছিলেন। তবে কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর এই চিত্র ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। কার্যক্রম শেষে পুষ্টিকর খাবারের দৈনিক গ্রহণের হার ৯০% এ উন্নীত হয়েছে, যা কর্মসূচির সাফল্যের এক স্পষ্ট প্রতিফলন।

কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বে অংশগ্রহণকারীদের মাত্র ৪৫%ই দৈনিক খাদ্যতালিকায় শর্করা, প্রোটিন, চর্বি, ফাইবার, ভিটামিন, খনিজ ও পানি সহ সুষম খাদ্য গ্রহণ করতেন, যেখানে ৫৫% অংশগ্রহণকারী সুষম খাদ্যের যথাযথ গ্রহণ নিশ্চিত করতে পারতেন না। কিন্তু পুনর্বাসন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর এই হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯৪%-এ, যা কর্মসূচির সফলতার প্রমাণস্বরূপ। অর্থাৎ, অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী এখন সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে সক্ষম হয়েছেন।

ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার আলোকে সমাজসেবা অধিদপ্তরের জেলা উপপরিচালক ও সমাজসেবা অফিসারগণ যেসব বিষয়ে মতামত প্রদান করেন তা হলোঃ উপকারভোগীদের মধ্যে অধিকাংশের পারিবারিক আয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকেই আগে দৈনিক ১ বা ২ বেলা আহার করলেও বর্তমানে অধিকাংশ উপকারভোগী ৩ বেলা পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করছেন। অধিকাংশ উপকারভোগী বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ যেমন: ছাগল/ভেড়া, মুদি দোকান, বকনা বাছুর, রিকশা-ভ্যান, সেলাই মেশিন ইত্যাদি পেয়েছেন এবং তা দিয়ে উপার্জন শুরু করেছেন। উপকরণগুলো উপকারভোগীদের আত্মনির্ভরশীলতার পথে এগিয়ে দিয়েছে, যার ফলে তারা সমাজে সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ করছেন। অনেক উপকারভোগী তাদের জীবনধারায় পরিবর্তন এনেছেন এবং সমাজে সম্মানজনক জীবনযাপন করছেন। অতীতে যারা ভিক্ষুক হিসেবে পরিচিত ছিলেন, এখন তারা দোকানি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বা পশুপালক হিসেবে পরিচিত।

দক্ষতা ও পেশা ভিত্তিক এককালীন আর্থিক অনুদানের প্রভাব

কার্যক্রমের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৫৫% অর্থাৎ ১৪২ জন আর্থিক অনুদান পেয়েছেন, যেখানে ৪৫% অংশগ্রহণকারী অর্থনৈতিক সহায়তা পাননি। মোট অনুদানপ্রাপ্তদের মধ্যে ৩১% (৪৪ জন) ছাগল ও ভেড়া পালন শুরু করেছেন, যা তাদের জন্য একটি সাশ্রয়ী এবং লাভজনক আয়ের উৎস হিসেবে কাজ করছে। একই সঙ্গে, ২১% (৩০ জন) গরু পালন করেছেন, যা অধিক পুঁজি ও সম্পদের প্রয়োজন সাপেক্ষ হলেও তুলনামূলকভাবে আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক।

দোকান খোলার মাধ্যমে ৩০% (৪২ জন) অর্থনৈতিক কার্যক্রম শুরু করেছেন। দোকান ব্যবসা সাধারণত নগর এলাকায় সহজলভ্য এবং স্থায়ী আয় নিশ্চিত করার জন্য একটি জনপ্রিয় উপায়। এছাড়া, ১৪% (২০ জন) অনুদান থেকে ভ্যান বা রিকশা চালকের কাজ শুরু করেছেন, যা গণপরিবহন খাতে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করেছে। অন্যদিকে, হাঁস-মুরগি পালন ৩% (৪ জন) ও সেলাই মেশিন ক্রয় করে সেলাইয়ের কাজ শুরু করেছেন মাত্র ১% (২ জন)। এই ফলাফল থেকে স্পষ্ট যে, আর্থিক অনুদান পুনর্বাসনের মূল উদ্দেশ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণের প্রভাব

উপকারভোগীর মধ্যে ৮০ শতাংশ (২০৯ জন) জানিয়েছেন যে, তারা সমাজসেবা অধিদপ্তরের পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ পেয়েছেন। এ উপকরণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো দোকান পরিচালনার সামগ্রী, গবাদিপশু (গরু/ছাগল), রিকশা/ভ্যান, হাঁস-মুরগি পালন উপকরণ ইত্যাদি। মুদি দোকানের সরঞ্জাম পেয়েছেন সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৫৯ জন (প্রায় ২৮%), যা ইঙ্গিত দেয় খুচরা ব্যবসায় প্রবেশের আগ্রহ এবং সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। ছাগল বা ভেড়া পেয়েছেন ৪৮ জন (২৩%)। এটি একটি গ্রামীণভিত্তিক সহজলভ্য আয়বর্ধক কার্যক্রম হিসেবে কাজ করছে। ভ্যান/রিকশা পেয়েছেন ৩৬ জন (১৭%), যারা পরিবহণ খাতে যুক্ত হয়ে আয় করছেন। বকনা বাছুর পেয়েছেন ৩৩ জন (১৬%), যা দীর্ঘমেয়াদি উপার্জনের সম্ভাবনা তৈরি করে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছেন ১৯ জন (৯%), যেমন: কুটির শিল্প, সেবামূলক পেশা ইত্যাদি। এছাড়া, চায়ের দোকান পেয়েছেন ১২ জন (৬%) এবং সেলাই মেশিন পেয়েছেন ২ জন (১%), যারা নিজ উদ্যোগে ছোট ব্যবসা পরিচালনায় সচেষ্ট। উপকারভোগীদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল: "আপনি কি প্রকল্প থেকে প্রদত্ত বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণে সন্তুষ্ট?" – এই প্রশ্নের উত্তরে দেখা গেছে, প্রায় ৯৫% উপকারভোগী (১৯৮ জন) ইতিবাচকভাবে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

এই বিপুল সংখ্যক সন্তুষ্ট উপকারভোগী নির্দেশ করে যে, প্রকল্পে বিতরণ করা উপকরণগুলো বাস্তব জীবনে ব্যবহারোপযোগী, প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং উপকারভোগীদের আয়ের পথ সুসংহত করতে সহায়ক হয়েছে।

জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক

সর্বমোট উত্তরদাতাদের ৯০ শতাংশ ব্যক্তি জানিয়েছেন যে তারা এই ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত। প্রকল্পভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করার পর ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করেছেন এমন ব্যক্তির হার ৯০ শতাংশ। অপরদিকে মাত্র ১০ শতাংশ ব্যক্তি জানিয়েছেন যে তারা এই কার্যক্রম গ্রহণের পরও ভিক্ষাবৃত্তি পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে

পারেননি। এই ফলাফলটি প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। এটি স্পষ্ট করে যে, সচেতনতামূলক কার্যক্রম ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৮৪% জানিয়েছেন যে ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সচেতনতামূলক কার্যক্রম কার্যকর ছিল। অপরদিকে ১৬% অংশগ্রহণকারী এ কার্যক্রমের কার্যকারিতা নিয়ে সন্দিহান বা অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এই ফলাফলটি থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রকল্পভুক্ত জনগোষ্ঠীর বৃহৎ একটি অংশ সচেতনতামূলক কার্যক্রম দ্বারা ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়েছেন এবং এটি তাদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে সহায়ক হয়েছে। জনাব মোঃ শাহ জাহান, উপপরিচালক (ভিক্ষুক, চা শ্রমিক ও হিজড়া), সমাজসেবা অধিদপ্তর বলেন যে, ভিক্ষাবৃত্তি একটি বহুমাত্রিক সামাজিক সমস্যা, যার সমাধানে কেবল আর্থিক সহায়তা বা পুনর্বাসন কার্যক্রম যথেষ্ট নয়। সমাজের সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিকতা ও আচরণে পরিবর্তন আনাই ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনের দীর্ঘমেয়াদি ও কার্যকর পথ। এ প্রেক্ষিতে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও পুনর্বাসন কর্মসূচিতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ে যেসব কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা হলো:

পথসভা ও প্রচারণা: বিভিন্ন হাট-বাজার, ধর্মীয় ও জনসমাগমস্থলে ভিক্ষাবৃত্তির কুফল এবং পুনর্বাসনের সুফল তুলে ধরে মাইকিং, পথনাট্য ও ছোটখাটো জনসভা আয়োজন করা হয়।

ব্যানার, পোস্টার ও লিফলেট: 'ভিক্ষা নয়, কাজই মুক্তি' জাতীয় বার্তা সম্বলিত উপকরণ বিতরণ ও স্থাপন করে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা হয়।

স্কুল, কলেজ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রচার: শিক্ষার্থীদের ও ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তি নিরুৎসাহিত ও কর্মমুখী মানসিকতা গড়ে তুলতে আলোচনা ও বার্তাবাহক কার্যক্রম চালু করা হয়।

স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততা: জনপ্রতিনিধি, ইমাম, শিক্ষক ও সমাজের নেতৃস্থানীয়দের মাধ্যমে জনমনে ভিক্ষাবৃত্তির বিরূপতা সম্পর্কে বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

অভিযান/মোবাইল কোর্ট বিষয়ক

মোবাইল কোর্ট বা অভিযান সম্পর্কে সচেতনতার বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৯০% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে তারা মোবাইল কোর্ট/অভিযান সম্পর্কে অবগত। অপরদিকে, ১০% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে তারা এ বিষয়ে অবগত নন। ৯০% অংশগ্রহণকারী মনে করেন, মোবাইল কোর্ট বা অভিযান স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। ৫৪% মনে করেন, এ ধরনের কার্যক্রম এলাকাকে ভিক্ষুকমুক্ত রাখতে সহায়ক। আর ২৩% উল্লেখ করেন যে তারা কাউন্সিলিং বা পরামর্শসেবা পেয়েছেন, যা তাদের মনস্তাত্ত্বিকভাবে সহায়তা করেছে। এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় যে, মোবাইল কোর্ট বা অভিযানের মাধ্যমে শুধু আইনগত বাধ্যবাধকতাই নয়, বরং সামাজিক পুনর্বাসন এবং স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রেও তা কার্যকর ভূমিকা রাখছে। তবে কাউন্সিলিং সেবাপ্রাপ্তির হার তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায়, এই খাতে আরও মনোযোগ বাড়ানো প্রয়োজন। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী সকল ব্যক্তি একমত হয়েছেন যে ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও পুনর্বাসনে মোবাইল কোর্ট ও অভিযান কার্যক্রম চালু রাখা উচিত। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯৩% মতামত দিয়েছেন যে মোবাইল কোর্ট ও অভিযান কার্যক্রম কার্যকর। অপরদিকে মাত্র ৭% এই কার্যক্রমকে অকার্যকর বলে মত দিয়েছেন। এই ফলাফল নির্দেশ করে যে, অভিযানের মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ ও পুনর্বাসনের প্রক্রিয়ায় দৃশ্যমান ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

উপপরিচালক (ভিক্ষুক, চা শ্রমিক ও হিজড়া)জানান যে, ভিক্ষাবৃত্তি একটি সামাজিক ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত, যা ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজে নানাবিধ নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সমাজসেবা অধিদপ্তর ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনে যেমন পুনর্বাসনমূলক ও বিকল্প কর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তেমনি আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ হিসেবে অভিযান এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে জনপদে ভিক্ষাবৃত্তি নিরুৎসাহিত করার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। রাস্তাঘাট, বাজার, বাসস্ট্যান্ড ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সামনে অসহায় ও পেশাদার ভিক্ষুকদের শনাক্ত করা। প্রকৃত ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের আওতায় আনা এবং পেশাদার বা ভাড়াটে ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আইন অমান্যকারীদের তাৎক্ষণিকভাবে জরিমানা/কারাদণ্ড প্রদান ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন। জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, সমাজসেবা অফিস এবং পুলিশের সমন্বয়ে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ভিক্ষার উদ্দেশ্যে শিশু ব্যবহারের মতো শাস্তিযোগ্য অপরাধে জরিমানা ও সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ভিক্ষুককে আটক না করে সঙ্গে সঙ্গেই পুনর্বাসন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়েছে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ফলে শহরাঞ্চলে বিশেষ করে বাণিজ্যিক এলাকা, বাসস্ট্যান্ড ও মসজিদের সামনে ভিক্ষাবৃত্তির হার দৃশ্যমানভাবে কমেছে।

দলীয় আলোচনায় জনপ্রতিনিধিরা বলেন, স্থানীয় পর্যায়ে অভিযানের উপস্থিতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে নিজেদের জীবিকা ভাবতে এবং কর্মসংস্থানের বিকল্প খুঁজতে। কেউ কেউ উল্লেখ করেন, মোবাইল কোর্ট না থাকলে অনেকেই পুনর্বাসনের গুরুত্ব বুঝত না। এলাকার নেতৃবৃন্দ বলেন, অভিযানের পরপরই অনেকে পেশা পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়, যা ভিক্ষাবৃত্তি হ্রাসে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশ মত দেন যে, এই মোবাইল কোর্ট ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা উচিত, কারণ এটি একটি নিয়ন্ত্রণমূলক এবং নজরদারি প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে। তারা বলেন, নিয়মিত অভিযান না হলে অনেকে পুনরায় ভিক্ষাবৃত্তিতে ফিরতে পারে। একাংশ বলেন, কঠোর অভিযানের পাশাপাশি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার।

দক্ষতা ভিত্তিক ও উপার্জনমুখী প্রশিক্ষণ, আবাসন ও প্রশিক্ষণ, আবাসন সুবিধা ও চিকিৎসা সেবা প্রদানে সীমাবদ্ধতা

জনাব মোঃ শাহ জাহান, উপপরিচালক (ভিক্ষুক, চা শ্রমিক ও হিজড়া), সমাজসেবা অধিদপ্তর বলেন যে, সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচি একাধারে একটি মানবিক ও উন্নয়নমুখী উদ্যোগ, যার মূল লক্ষ্য সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে স্বনির্ভর করে তোলা। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকারভোগীদের মাঝে জীবিকাভিত্তিক উপকরণ বিতরণ, আয়ের সুযোগ সৃষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টির উন্নয়ন এবং সামাজিক মর্যাদার পুনরুদ্ধার লক্ষ্য করা গেছে। তবে প্রকল্প পরিচালক স্বীকার করেছেন

যে, বাজেট ঘাটতির কারণে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এখনো বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি, যা এই উদ্যোগের পূর্ণতা প্রাপ্তিতে অন্তরায় সৃষ্টি করছে।

দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করতে না পারাঃ

প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হলেও তা ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়নি। এতে অনেক সময় উপকারভোগী উপকরণের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারছেন না।

আবাসন সুবিধার ব্যবস্থা করতে না পারা

ভিক্ষুকদের একটি বড় অংশ রাস্তার পাশে বা অস্থায়ী আশ্রয়ে বসবাস করতেন। প্রকল্পে আবাসনের জন্য পরিকল্পনা থাকলেও বাজেটের অভাবে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি, ফলে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থানের নিশ্চয়তা দেওয়া যায়নি।

চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে না পারা

ভিক্ষুকরা সাধারণত দীর্ঘদিন অনাহার ও অপুষ্টিতে ভোগার কারণে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় আক্রান্ত থাকেন। প্রকল্পে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বা চিকিৎসা সহায়তা দেওয়ার কথা থাকলেও অর্থ সংকটে তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন হয়নি। প্রকল্পটি যতটা না কেবল একটি ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন কর্মসূচি, তার চেয়েও বেশি এটি একটি সমন্বিত মানব উন্নয়ন কর্মসূচি। তাই বাজেট বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা ও আবাসন এই তিনটি উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা অত্যাবশ্যক। এসব উপাদান বাস্তবায়ন সম্ভব হলে উপকারভোগীদের জীবনযাত্রায় টেকসই হবে এবং তারা সমাজে সম্মানজনক অবস্থান লাভ করতে পারবেন।

গবেষণার সীমাবদ্ধতাসমূহ

ক) ভিক্ষুকদের অধিকাংশের যোগাযোগের মোবাইল নম্বর না থাকা:

ভিক্ষুকদের মধ্যে অনেকের নিজস্ব মোবাইল ফোন নেই বা নম্বর পরিবর্তনশীল, ফলে তথ্য সংগ্রহ বা অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

খ) ভিন্ন ভিন্ন এলাকার ভিক্ষুক হওয়া:

ভিক্ষুকদের নির্দিষ্ট ঠিকানা বা বসবাসের স্থান না থাকায় অনেককে পুনরায় খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়েছে, বিশেষ করে যারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এলাকায় ভিক্ষাবৃত্তি করে।

গ) প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা ও আবাসনের বাস্তবায়ন না হওয়া:

দক্ষতা উন্নয়ন, চিকিৎসা সহায়তা ও আবাসনের কার্যক্রম পুরোপুরি বাস্তবায়িত না হওয়ায় প্রকল্পের প্রভাবের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি।

ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও পুনর্বাসন কর্মসূচির পর্যবেক্ষণ

ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনে সরকারের গৃহীত কর্মসূচি একটি মানবিক, সময়োপযোগী ও টেকসই সামাজিক হস্তক্ষেপ, যা রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতার অনন্য উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের একটি কাঠামোগত ও পরিকল্পিত রূপ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। যা সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও মর্যাদার জীবনযাপনে উৎসাহিত করেছে। এককালীন আর্থিক সহায়তা ও বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ সরবরাহ অনেক উপকারভোগীকে স্ব-কর্মসংস্থান তৈরিতে সক্ষম করেছে যা আত্মনির্ভরশীলতার পথে একটি বড় পদক্ষেপ। মোবাইল কোর্ট ও অভিযান কার্যক্রম সমাজে সচেতনতা ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে যা স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্বশীলতা ও তৎপরতার পরিচায়ক। উপকারভোগীদের অধিকাংশই মোবাইল কোর্টকে কার্যকর ও নিয়মিত রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন যা কর্মসূচির গ্রহণযোগ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ।

ভিক্ষুকদের পরিবারে খাদ্যাভ্যাস, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের মান কিছুটা হলেও উন্নত হয়েছে বিশেষ করে যারা উপকরণ পেয়েছেন এবং তা সঠিকভাবে ব্যবহার করেছেন। সামাজিকভাবে অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় মূলস্রোতে অন্তর্ভুক্তির জন্য একটি দৃষ্টান্তমূলক প্রয়াস হিসেবে এই কর্মসূচি ব্যাপক ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। জনপ্রতিনিধি ও সমাজসেবকদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক সহযোগিতা ও মনোভাব পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করে সম্মানজনক জীবনের প্রতি মনোভাব গড়ে তুলতে এই কর্মসূচি মনস্তাত্ত্বিকভাবে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে এই কার্যক্রমের বর্তমান অর্জনগুলো ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে যা একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে। বিকল্প আয়ের জন্য দেওয়া উপকরণ যেমন গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, দোকানঘর ইত্যাদির ব্যবহার সীমিত পর্যায়ে কার্যকর হয়েছে তবে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের অভাবে অনেকেই সফলভাবে তা পরিচালনা করতে পারছে না। এককালীন আর্থিক অনুদান অনেকের ক্ষেত্রে কার্যকর কিন্তু তা যদি সঠিকভাবে ব্যয় না হয় বা মনিটরিং না থাকে তাহলে তার প্রভাব ক্ষণস্থায়ী হয়। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা পুনর্বাসন কার্যক্রমকে ইতিবাচকভাবে নিয়েছেন তবে তারা আরও বেশি স্থায়ী কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। ভিক্ষাবৃত্তিতে ফেরার ঝুঁকি এখনো বিদ্যমান। বিশেষ করে যাদের আয়ের উৎস অনিয়মিত বা যাদের ব্যবসায়িক উপকরণ নষ্ট হয়েছে । নারী সুবিধাভোগীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস কিছুটা বেড়েছে, কিন্তু তারা অনেকেই পারিবারিক নিয়ন্ত্রণে থাকায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সীমাবদ্ধতা অনুভব করেন।

সুপারিশ

১) **দীর্ঘমেয়াদী ও ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা**
উপকারভোগীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পেশাভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ (যেমন– পশুপালন, হস্তশিল্প, ক্ষুদ্রব্যবসা) নিয়মিত ও পর্যাপ্ত সময় ধরে পরিচালনা করা প্রয়োজন।

২) **পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান জোরদার করা**
এককালীন অনুদান কিংবা উপকরণ প্রদান করার পর নিয়মিত মনিটরিং নিশ্চিত করতে হবে, যেন উপকারভোগীরা সঠিকভাবে তা ব্যবহার করছেন এবং পুনরায় ভিক্ষাবৃত্তিতে ফিরে না যান।

৩) **উপকরণ ও অনুদান নির্বাচন ক্ষেত্রে চাহিদাভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণ**
উপকারভোগীর দক্ষতা, পছন্দ এবং বাজার পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে আয়বর্ধক উপকরণ/অনুদান নির্বাচন করা উচিত।

৪) **সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সঙ্গে সংযুক্তকরণ**
উপকারভোগীদের ভাতা (বয়স্ক, বিধবা, প্রতিবন্ধী) প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের একটি সামাজিক সুরক্ষা কাঠামোর আওতায় আনা উচিত।

৫) **স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দকে যুক্ত করা**
পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ, ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের

সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করলে কার্যক্রম বেশি কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য হবে।

৬) **জনসচেতনতা কার্যক্রম সম্প্রসারণ**
ভিক্ষাবৃত্তির কুফল, বিকল্প পেশার সম্ভাবনা ও সরকারি সহায়তা বিষয়ে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারাভিযান চালানো উচিত।

৭) **অভিযান ও মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম নিয়মিত রাখা**
অভিযানের মাধ্যমে নতুন ভিক্ষুক শনাক্ত ও পুনর্বাসনের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ রোধ করা দরকার।

৮) **নারী সুবিধাভোগীদের জন্য বিশেষ সহায়তা**
নারীদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ, শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সুবিধা এবং প্রয়োজনীয় সাইকোসোশিয়াল কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

৯) **উদ্যোক্তা ভিত্তিক পুনর্বাসন কার্যক্রম চালু করা**
যারা উদ্যোক্তা হওয়ার সক্ষমতা রাখে তাদেরকে দলবদ্ধভাবে ক্ষুদ্র ব্যবসার উদ্যোগে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

১০) **ডেটাবেজ এবং ট্র্যাকিং সিস্টেম তৈরি**
উপকারভোগীদের তথ্য সংরক্ষণ, অগ্রগতি ট্র্যাকিং এবং ভবিষ্যত সহায়তার জন্য একটি কেন্দ্রীয় তথ্যব্যবস্থা (MIS) গড়ে তোলা উচিত।

উপসংহার

সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও পুনর্বাসন কর্মসূচি দেশের প্রান্তিক, অসহায় ও জীবনধারণে অক্ষম জনগোষ্ঠীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক হস্তক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই গবেষণায় সংগৃহীত তথ্য ও পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা গেছে, উপকারভোগীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এককালীন আর্থিক সহায়তা, বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ এবং কাউন্সেলিং প্রাপ্তির মাধ্যমে ধীরে ধীরে স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আয় বৃদ্ধি, খাদ্যনিরাপত্তা, বাসস্থান উন্নয়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মতো ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। অভিযানের মাধ্যমে ভিক্ষুক শনাক্তকরণ ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বিষয়টি বেশিরভাগ উপকারভোগী এবং কমিউনিটি প্রতিনিধি কর্তৃক ইতিবাচক হিসেবে চিহ্নিত হলেও তার কার্যকারিতা আরও সুসংগঠিত ও নিয়মিত করা প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, কর্মসূচিটি একটি সম্ভাবনাময় ও সময়োপযোগী উদ্যোগ হলেও এর টেকসই সফলতা নির্ভর করছে কার্যকর তত্ত্বাবধান, অংশীজনদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং প্রেক্ষিতভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ওপর। ভবিষ্যতে, উপকারভোগীদের চাহিদানির্ভর প্রশিক্ষণ, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সঙ্গে সংযুক্তকরণ, এবং সচেতনতা কার্যক্রম জোরদার করার মাধ্যমে এই উদ্যোগকে আরও সমৃদ্ধ ও ফলপ্রসূ করা সম্ভব হবে।

গবেষণা নৈতিকতা

এই গবেষণার সমস্ত প্রক্রিয়া জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি এর নির্ধারিত নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সম্পন্ন হয়েছে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোর অনুমোদনক্রমে পরিচালিত হয়েছে। সকল উপকারভোগীর নিকট থেকে গবেষণা নির্দেশিকা অনুযায়ী লিখিত অথবা মৌখিকভাবে অবগত সম্মতি (Informed Consent) গ্রহণ করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১) হোসেন, মোঃ ইমাম, (২০২৫), *ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও পুনর্বাসনে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়ন,* জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি, সমাজসেবা অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

২) সমাজসেবা অধিদপ্তর (২০২৩)। *ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন,* বাংলাদেশ সমাজসেবা অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

৩) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২২)। *দারিদ্র্য পরিস্থিতি ও গৃহস্থালির আর্থসামাজিক জরিপ ২০২২,* পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার।

৪) পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF)। *আয়বর্ধক কর্মসূচি ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সফলতা,* অভ্যন্তরীণ গবেষণা প্রতিবেদন, ২০২১।

৫) ব্র্যাক (২০২০)। *চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রভাব,* ব্র্যাক গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ।

৬) বাংলাদেশে সংবিধান, ১৯৭২

৭) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (২০১৮), ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান নীতিমালা।

৮) দৈনিক কালবেলা'র ২৭শে আগষ্ট ২০২৩, 'একমুঠো ভিক্ষা' দিয়ে ভিক্ষুক পুনর্বাসন!।

৯) প্রথম আলো, ২ জুলাই ২০১৫, শিশু ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনে সুশীল সমাজ ও করপোরেট খাতের ভূমিকা।

১০) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (২০১৫), ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) বিধিমালা।

১১) ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২০২৫, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

12) Ahmed, S. (2021). *Development Policies for Eradication of Begging*. Global Social Policy Review, 7(3), 55-73.

13) Asian Development Bank (ADB) (2020). *Inclusive Livelihood Support and Rehabilitation Measures for Vulnerable Groups in Bangladesh*.

14) Department of Social Services. (2021). *Guide Line of Programme on Rehabilitation and Alternative Employment for the People Engaged in Begging*. Ministry of Social Welfare, Government of the People's Republic of Bangladesh.

15) Friedlander, Walter A & Apte, Robert Z (1963). Introduction to Social Welfare (1 edition), New Delhi, Prentice-Hall of India Private Limited

16) ILO (2019). *Decent Work and Social Inclusion for Marginalized Urban Populations*. International Labour Organization.
17) International Labour Organization (ILO) (2019). Decent Work and the Informal Economy: Global Report under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. Geneva: ILO.
18) Islam, M. S. (2022). *Eradication of Street Begging in Bangladesh: In Islamic Perspective*. Journal of Social Development Studies, 9(2), 45-58.
19) Karim, A., & Hossain, T. (2022). *Development Policies for Eradication of Street Begging in Bangladesh*. Policy Review Journal, 11(4), 102-120.
20) Ministry of Social Welfare, Bangladesh (2023). *Annual Report on Beggar Rehabilitation Programmes*, Department of Social Services (DSS).
21) Rahman, M. M., & Akter, S. (2023). *Beggars Rehabilitation Initiatives: An Assessment of Narail District*. Bangladesh Development Research Journal, 15(1), 72-89.
22) UNDP Bangladesh (2022). *Poverty and Vulnerability in Urban Settings: Challenges of Social Protection*. United Nations Development Programme.
23) UN-HABITAT (2016). *Urban Poverty and Homelessness: A Global Challenge*. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme.
24) World Bank (2021). *Pathways to Reducing Begging and Building Sustainable Livelihoods in South Asia*. World Bank Group, Social Protection & Jobs Global Practice.